রাহমাতুল্লিল আলামীন

وما ارسلنك الا رحمة للعلمين

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

রাহ্‌মাতুল্লিল্ আ'লামীন্

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

তরজমা ও সম্পাদনায়ঃ
লুৎফর রহমান ফারুকী

দি সাইয়েদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

লেখকঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ)

তরজমা ও সম্পাদনায়ঃ লুৎফুর রহ্মান ফারূকী

প্রকাশক ঃ এস, এম, কায়কোবাদ

দি সাইয়েদ্ পাবলিশিং হাউস।

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায় ঃ এ. কে. এম ইসমাইল হোসেন

মুদ্রণে ঃ প্রিন্টার্স হ্যাভেন, ঢাকা।

প্রকাশ কাল ঃ জানুয়ারী ১৯৯৩ রজব ১৪১৩

বিনিময় ঃ নিউজ ১০ টাকা। ১২ টাকা।

সাদা ১৫ টাকা। ১৪ টাকা ১২ টাকা

RAHMATULLIL A'LAMIN BY MAULANA
SAIYED ABUL A'LA MAUDUDI (RH.)
TRANSLATED AND EDITED BY MR. LUTFUR
RAHMAN FAROOQI, RESEARCH ASSOCIATE,
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY,
ISLAMABAD.
THE BOOK IS PUBLISHED BY MR. S. M.
KAIKOBAD. CHIEF EXECUTIVE OF
THE SAIYED PABLISHING HOUSE
2 NO. WISEGHAT ISLAMPUR ROAD DHAKA-1100
BANGLADESH

হেরার রশ্মি (আল কোরআন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا
أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۖ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ۝
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

সেই দিন, যেদিন আমরা আসমানকে কাগজের পৃষ্ঠাগুলোর মত ভাঁজ করে রাখব, যেভাবে সর্বপ্রথম আমরা সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, অনুরূপভাবে আমরা তার পুনরাবৃত্তি করব। এটা একটা ওয়াদা বিশেষ, যা পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের। আর এ কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে। আর যবুর কিতাবে নসীহতের পর আমরা লিখে দিয়েছি যে, আমাদের নেক বান্দাগণই যমীনের উত্তরাধিকারী হবে। এতে এক মহাকল্যাণ নিহিত রয়েছে ইবাদাতকারী লোকদের জন্য। হে মুহাম্মদ! (আমরা যে তোমাকে পাঠিয়েছি, আসলে এটা দুনিয়াবাসীদের জন্য আমার রহমত বিশেষ।

(সূরা আল– আম্বিয়া– ১০৪–১০৭

হাদীসে রাসূল (সাঃ)

৪৩৭৯. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ভাষণে বলেনঃ কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহ্‌র সামনে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হবে,-- "যেমন প্রথম দিন সৃষ্টি শুরু করেছিলাম, তেমনি তার পুনরাবৃত্তি করবো, এটা আমার একটা ওয়াদা, তা পূরণ করা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।" অতঃপর সর্বপ্রথম ইবরাহীমকে (আঃ) পোশাক পরানো হবে। সাবধান হয়ে যাও, আমার উম্মতের কিছু লোককে ধরে আনা হবে। তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত। জবাবে আমাকে বলা হবে, তুমি জানো না তোমার পরে এরা কত নতুন কথা তৈরী করেছিল। আমি তখন আল্লাহ্‌র সৎ বান্দা ঈসার মতো বলবোঃ "ওয়া কুন্‌তু আলাইহিম্ শাহীদাম্ নাদুমতু" যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কিন্তু আমার পর তুমিই তাদের সাক্ষী। তখন বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে চলে আসার পর এরা (তোমার দ্বীন থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উল্টো পথে চলেছিল।

সহীহুল বুখারী

কিতাবুল্ তাফসীর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানের রাহিম

প্রকাশকের আরজ

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) সম্পর্কে কিছু বলব, বা তার পরিচয় তুলে ধরার কোন প্রয়োজন নেই। আজ মওলানা মওদূদীর বিপ্লবী সাহিত্য দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে গেছে। দুনিয়ার অগনিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ মওলানার জীবন-সাহিত্য, আন্দোলন-সংগঠণ সম্পর্কে গবেষণা চলছে। তাঁর রচিত বিশাল সহিত্য ভাণ্ডার থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ **রাহ্‌মাতুল্লিল আ'লামীন** শিরোনামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা আকারে অনুবাদ করে সংকলন করেছেন, ইসলামাবাদস্থ আন্তার্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত গবেষক জনাব লুৎফুর রহমান ফারুকী। এই পুস্তিকাতে মানবজাতির জন্য শান্তি ও কল্যাণের বার্তাবাহক, পথপ্রদর্শক, বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অন্যতম গুণ **'রাহমাতুল্লিল আলামীন'** অনুপম মহিমায় চিত্রিত হয়েছে।

এখানে আরও উল্লেখ্য মওলানা মওদূদী (রঃ) ১৯৬৯ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) সফরকালে ঢাকা ও খুলনায় অনুষ্ঠিত দুটি সীরাত মাহ্‌ফিলে যে ভাষণ প্রদান করেন তা এ পুস্তিকাতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এ পুস্তিকার সূচনা হয়েছে সে ভাষণ দিয়েই। পাঠক কিছুদূর অগ্রসর হলেই বুঝতে পারবেন কত সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী এ হেদায়াত। এরপর মওলানার অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কয়েকটি চয়নিকা আছে, যার সূত্রও উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করি সুধী পাঠক তাও অনুধাবণ করতে পারবেন।

মানবতার প্রতি প্রদত্ত স্রষ্টার এই রহমত তথা মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সাইয়্যেদুল মুরসালীনের সীরাত থেকে আল্লাহ্‌ পাক আমাদের হেদায়াতের সত্য-সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

বিনীত প্রকাশক

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বই

১। আত্মপরিচয়ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

২। আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও যুব সমাজ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

৩। কালেমায়ে তাইয়্যেবা ও আমাদের দায়িত্ব

মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন

৪। ইসলামী আন্দোলন ও আমাদের ঘর

শাব্বির আহমদ মান্যার কুদ্দূসী

৫। ইসলামের পূর্ণ জাগরণে শিক্ষকের ভূমিকা

খুর্‌রম মুরাদ

দি সাইয়েদ পাবলিশিং হাউস

২নং ওয়াইজ ঘাট ইসলামপুর রোড

ঢাকা-১১০০

[আপনার যে কোন অর্ডার আমরা দায়িত্ব সহকারে পাঠিয়ে দেব শুধুমাত্র ডাকযোগে আমাদের অবহিত করলেই চলবে।]

সূচীপত্র

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

রাহমাতুল্লিল আ'লামীন

মহানবী (সঃ) এর শুভাগমন কালে বিশ্বের পরিস্থিতি কেমন ছিল? কোরআনের এ আয়াতটি সেদিকে ইংগিত করেছে। ঘোষণা করা হয়েছে,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ

"জলভাগ ও স্থলভাগে মানুষেরই কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।" অর্থাৎ জল ও স্থল ভাগে যে বিপর্যয়ের অবস্থা বিরাজমান তা মানুষের কৃতকর্মেরই ফল। সে যুগের দু'টি বৃহৎ পরাশক্তি আজকের রাশিয়া ও আমিরিকার মত ক্ষমতাশীল ছিল। উভয় শক্তি পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। সে যুগের গোটা সভ্য জগতে অশান্তি অস্থিরতা ও বিপর্যয়ের অবস্থা বিরাজমান ছিল। আরব বিশ্বও এ অশান্তি এবং বিপর্যয় মুক্ত ছিল না। বরং আরবের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। অবস্থা এত শোচনীয় ছিল, যে সে ধ্বংসের মুখে অবস্থান করছিল। এ চিত্রটিই কোরআনে মজীদে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ

"আর তোমরা অগ্নিকুন্ডের পার্শ্বে দন্ডায়মান ছিলে।"

মহানবী (সঃ) এর শুভাগমন কালে বিশ্বের অবস্থা

কোরআনে মজীদ তৎকালীন আরবের যে নিঃখুঁত চিত্র তুলে ধরেছে, ইতিহাস অধ্যয়নকারী মাত্রই তা উপলব্দি করতে পারে। অজ্ঞতা বর্বরতা ও

জাহেলী বিদ্বেষের কারণে অনর্থক যুদ্ধ বাধতো, এর কোন কোন যুদ্ধ শতাব্দী ব্যাপী অব্যাহত ছিল। এতেই বুঝা যায় যে, এ সকল যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে আরব ভূখন্ড কিভাবে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছিল। অপরদিকে তাদের স্বাধীনতা বলতেও কিছু ছিল না, ইয়ামেন ছিল হাবশার দখলে অবশিষ্ট আরবের কিছু অংশের উপর ইরানের অধিপত্য ছিল বাদবাকী অংশ ছিল রোমের প্রভাবধীণ। গোটা আরব বিশ্ব জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তৎকালীন দুই বৃহৎ শক্তি ইরান ও রোমের নৈতিক অবস্থাও বর্তমান যুগের আমেরিকা ও রাশিয়ার চাইতে ভিন্নতর ছিল না। গোটা বিশ্ব বিভিন্ন সম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কারণে দলে উপদলে বিভক্ত ছিল। এ সকল দল উপদল ইরান কিংবা রোমের সমর্থনপুষ্ট ছিল। এ পরিস্থিতিতে মহানবী (সঃ) এর আবির্ভাব হয়। তিনি বিশ্বের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মত গোত্র ও সম্প্রদায়ের পতাকা উত্তোলন করেননি তিনি কোন জাতিয়তাবাদের শ্লোগান দেননি। কোন অর্থনৈতিক শ্লোগানও তিনি দেননি। এর কোন একটির দিকেও তিনি মানুষকে আহ্বান করেননি।

যে জিনিসটির দিকে তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন তার এক অংশ হচ্ছে যে, সকল মানুষ সকল প্রকার গোলামীর বন্ধন ছিন্ন করে একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করুক।

বনী–আদমকে তৌহিদের দিকে আহ্বান

মানুষকে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেছেন। তাদেরকে কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, মানুষ আল্লাহ* ছাড়া অন্য কাউকে যেন কার্যসিদ্ধকারী মনে না করে। এ দাওয়াত তিনি কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা জাতিকে উদ্দশ্যে করে দেননি বরং গোটা বনী–আদমকে উদ্দেশ্য করে দিয়েছেন। তাঁর এই তৌহীদের বানী ছিল গোটা বনী–আদমের জন্যে, মানুষকে তিনি সাদা কিংবা কালো, আরব কিংবা অনারবের ভিত্তিতে আহ্বান

করেননি। তাদেরকে তিনি আরব জাতিয়তা কিংবা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতেও আহ্বান কনেনি, বরং আহ্বান করেছেন বনী-আদম হিসেবে।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ.

"হে মানুষ বলে"। আর যে জিনিসটির প্রতি তিনি মানুষকে আহ্‌বান করেছেন তার আবেদনও জাতিয় কিংবা আঞ্চলিকতা ভিত্তিক ছিল না বরং তা ছিল মানুষের সংস্কারের মূল ভিত্তিক নির্ভেজাল তৌহীদের দাওয়াত। এ দাওযাতের মূল কথাই ছিল এই যে, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যান্য খোদার কাছে ধর্নাদেয়াই হচ্ছে সকল অনিষ্টের মূল। আর মানুষের সংশোধনের একমাত্র পথই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়া। এ পথেই মানুষ ও সমাজ সংস্কার সম্ভব এছাড়া শতচেষ্টা করা সত্ত্বেও সমাজ সংস্কার করা সম্ভব নয়। অপর যে জি জিনিসটির প্রতি তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন তা হচ্ছে পরকালের ধারণা। ব্যাক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে তিনি নিজের কৃতকর্মের জন্যে জবাবদেহী সাব্যস্ত করেছেন। যেন প্রত্যেকের মধ্যেই এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে তার কৃতকর্মের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে তাকেই জাবাদেহী করতে হবে। জাতি যদি পথভ্রষ্ট হয় ও অন্যায় করে এমতাবস্থায় সেও যদি গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যায় তখন তাকে কোন অবস্থাতেই ছাড়া হবে না। তাঁর এ যুক্তি কোন কাজেই আসবে না যে, আমি যে জাতির সদস্য ছিলাম সে জাতি হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না।

তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, পথভ্রষ্ট জাতির সদস্য হয়েও তুমি সৎপথ অবলম্বন করতে পারতে। কেন তুমি বল্গাহারা ছিলে?

মহানবী (সঃ) মানুষের মনে প্রথমে তৌহীদ ও আখেরাতের মৌলিক ধারণা দু'টি বদ্ধমূল করেছেন আর তা দৃঢ় করার জন্যে দীর্ঘদিন যাবৎ পরিশ্রম করেছেন। একাজে তাকে প্রচুর জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর পথে কাঁটাও বিছানো হয়েছে, তবুও তিনি কাউকে একটি কটু কথাও বলেননি তাঁর উপর পাথর বর্ষিত হয়েছে, বার বার তাঁকে গালি খেতে হয়েছে তবুও ধৈর্য ধারণ করেছেন। তিনি মানুষকে একথা শিক্ষা দিয়েছেন যে,

"খোদা ও পরকালের ধারণাহীন মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।"

এ দুটি মৌলিক বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধ মূল করে দেয়ার পর তাদের সামনে ব্যবহারিক জীবনের কার্যক্রম রাখেন।

জীবনের ব্যবহারিক কার্যক্রম

ব্যবহারিক কার্যক্রমের প্রথম জিনিস হচ্ছে নামায। বিশ্বাসীদেরকে তিনি সর্বপ্রথম এ নামাযের জন্যেই তাগিদ করেছেন নামাযের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের মনে একথা বদ্ধমূল করা যে, আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাকে কেবল তারই সামনে নত হতে হয় এবং একমাত্র তারই আনুগত্য করতে হয়।

নামাযের সাথে সাথে যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র পথে দান করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। রোযার নির্দেশ এসেছে আরও পরে। নামাযের পর যে জিনিসটির প্রতি জোর দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে যাকাত। এর কারণ এই যে মানুষের ভেতরে সবচাইতে বড় ফিতনা হচ্ছে ধন সম্পদের ভালবাসা। এজন্যেই কোরআনে মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে–

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

"প্রাচুর্যের লালসা তোমাদিগকে গাফিলতির মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছে ততদিনে তোমরা কবর পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে।"

অর্থাৎ পার্থিব জগতের সম্পদের প্রাচুর্য মানুষের মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। হাদীস শরীফে আছে যে, সম্পদের একটি পাহাড়ও যদি মানুষের হাতে আসে সে আর একটির খোজে বের হয়। এ লালসা ও মোহ দূর করার জন্যেই যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্যে তাকিদ করা হয়েছে। আর একদিকে মানুষকে যাকাত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অপরদিক এও বলা হয়েছে যে, মানুষ যেন হালাল ও বৈধ উপায়ে উপার্জন করার চিন্তা করে।

চোর যদি যাকাত দেয়ার কথা চিন্তা করে তখন স্ববাবতই তার মনে এ কথাও জাগবে যে, উপার্জন ও বৈধ উপায়ে হওয়া আবশ্যক। এতে বৈধ পথে ব্যয় করার অভ্যাস হবে। এতে সে অন্যদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হবে কারণ তাকে এ কথাও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তার উপার্জিত সম্পদ অন্যদেরও অধিকার আছে।

وَفِىٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ٥

"আর তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের অধিকার আছে।"

এ ব্যবহারিক কার্যক্রম দুটি হচ্ছে মানুষের সংশোধন সংস্কারের ভিত্তি। চৌদ্দশ বছর পূর্বের এ সংস্কার কার্যক্রম আরবের জন্যে যেমন ছিল গোটা বিশ্বের জন্যেও ছিল তাই বর্তমানেও তা সংস্কার কার্যক্রম হিসেবে বিদ্যমান।

কোন লোক যদি আল্লাহ্‌কেই না চেনে, তার অন্তরে যদি পরকালের ভয় না থাকে তখন তার সামনে অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম রাখা অর্থহীন, আল্লাহ্‌ ও পরকালের ভয় না থাকলে কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার করা অসম্ভব। আর দুনিয়ার যে সকল জুলুম অত্যাচার চলেছে তাও দূর করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌ ও পরকালের উপর বিশ্বাস এবং জবাবদেহির ভয় ছাড়া যে কোন মানুষ কিংবা দল বা সম্প্রদায় সংস্কার করার জন্যে আসবে তখন তা সংস্কারের পরিবর্তে ফাসাদ ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তার হাতে ক্ষমতা আসলে আল্লাহ্‌ ও পরকালের ভয় যদি না থাকে তা হলে কিসের ভয়ে সে ঘুষ খাওয়া থেকে বিরত থাকবে? দেশের আইন যতই সুন্দর ও কল্যাণকর হউক না কেন তা বাস্তবায়িত করার জন্যে যে গুণ বিশিষ্ট মানুষের প্রয়োজন হবে তা কোথা থেকে আসবে?

ঈমান ও নৈতিক শক্তি

আইনের অবস্থাও তাই। কেউ যদি দাবী করে যে সে নামাযে বিশ্বাস রাখে অথচ তার কানে আযানের আওয়াজ আসা সত্ত্বেও সে নামাযের জন্যে উঠে না।

সে যাকাতেও বিশ্বাস করে কিন্তু তার কাছে যাকাত চাওয়া হলে বলে "অর্থের প্রয়োজন হলে এখানে" তখন এধরনের লোকের সংস্কারে সাধ্য কার আছে? এটা জানা কথা যে, আল্লাহ্র ভয় শুন্য অন্তরে কোন অবস্থাতেই দ্বীনের জন্যে আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে না।

মক্কী যুগে মহানবী (সঃ) এসকল নীতিরি ভিত্তিতে মানুষকে সংশোধন করেছেন। মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গেলে এ সকল প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের একটি ক্ষুদ্রদলও তাঁর সাথে ছিল। বদরের যুদ্ধের সময় তাঁদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের জন। এরা যখন ওহুদের ময়দানে উপস্থিত হয় তখন সংখ্যা দাঁড়ায় সাতশত। বৈষয়িক দৃষ্টিতে এ সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু যেহেতু তারা সংস্কার প্রাপ্ত ছিল, আল্লাহ্র একত্ব ও পরকালের উপর তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল এজন্যে তারা নিজেদের চাইতে কয়েকগুণ প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হয়েছে। আর নয় বছর কাল অতিক্রম করতে করতে গোটা আরব ভূখন্ডের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

এটা ধারণা করাঠিক নয় যে, তাদের তলোয়ার অপ্রতিরোধ্য ছিল। এত শক্তিশালী ছিল যে, গোটা আরব তার সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি, অতএব পদানত হতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধে নিহতদের যে সংখ্যা ইতিহাসে পাওয়া যায় তা হচ্ছে মাত্র বারশ' জন। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সঃ) সাহাবাদের মধ্যে যে, চারটি চারিত্রিক গুনাবলীর (তৌহীদ, আখেরাত, নামায, যাকাত) ভিত্তিস্থাপন করেছেন, এ সাফল্য হচ্ছে তারই ফল। এ বিজয় রণাঙ্গণে না হয়ে নৈতিক চরিত্রের ময়দানে হয়েছে। এ বিজয় ছিলো সেই নৈতিক ভুমিকারই কারণে যেজন্যে তারা রণাঙ্গণেও সত্য ন্যায়ের পথ থেকে এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হননি। অবর্তীর্ণ হয়েছেন সত্য প্রচার ও আলোর প্রসারের জন্যে। এ বিজয়কে আমরা সেই নৈতিক চরিত্রেরই বিজয় হিসেবে আক্ষায়িত করবো যা মহানবী (সঃ) অতি যত্নে গঠন করেছেন। তাঁরা কোন দেশে শাসন ক্ষমতা লাভ করলেও ক্ষমতার পরিবর্তে তাদের নৈতিক চরিত্রের দ্বারাই মানুষ বেশী প্রভাবিত হয়েছে।

এর পূর্বে কোন শাসনকর্তাকে মানুষ পাতার আসনে বসে রাজ্য শাসন করতে দেখেনি। শাসক সম্প্রদায়কে নিজেদের আরাম আয়েস ঠাট বাট ও জৌলুসের পরোয়া না করে কেবল সৃষ্ট জীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করতেও তারা দেখেনি। তাদের রাত্রি জাগরণের কারণেই জনগণ নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পেরেছে। তারা মানুষের দেহের উপর রাজত্ব করেনি রাজত্ব করেছে মানুষের অন্তরের রাজ্যে। মহানবী (সঃ) এর সে শিক্ষা আজও বর্তমান। আজও যদি মুসলমানরা সে শিক্ষা অনুসারে চলে তখন তাদের অতীত গৌরব ফিরে আসতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ٥

'হে নবী (সঃ) আমরা তোমাকে বিশ্বের কল্যাণের জন্যেই পাঠিয়েছি।' "মহানবী, কি করে বিশ্বের কল্যাণ ও রহমত ছিলেন? তা বর্ণনা করার জন্যে অসংখ্য ভাষণ ও শত শত গ্রন্থ রচনা করাও যথেষ্ট হতে পারে না। তার কল্যাণ শুমার করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তার মাত্র একটি দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বুঝতে পারবেন যে, গোটা মানব জাতির ইতিহাসে একজন মাত্র মানুষের সন্ধান মেলে যাকে সত্যিকারের অর্থে মানব জাতির রহমত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মানব সমাজের জন্যে তিনি এমন কতগুলো নীতি পেশ করেছেন যার ভিত্তিতে সকল মানুষ মিলে একটি পরিবার গঠন করতে পারে। একই নীতির ভিত্তিতে বিশ্বরাষ্ট্র (World state) ও গঠিত হতে পারে আর যুগ যুগ ধরে চলে আসা মানুষে মানুষে ভেদাভেদের কারনে জুলুম ও অত্যাচারের অবসান হতে পারে।

বিভিন্ন সভ্যতার নীতি

আমার বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্যে প্রথমে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার নীতি তুলে ধরবো, যেন তুলনামূলক অধ্যয়নের ফলে মহানবী (সঃ) যে নীতিমালা পেশ করেছেন তার শ্রেষ্ঠত্ব জানা যায়। বিশ্বে অতীতে যে সকল সভ্যতা বিদ্যমান

ছিল সে সকল সভ্যতা যে নীতিমালা পেশ করেছিল তা মানুষকে একাত্ম না করে তাদের মাঝে দূরত্ব বৃদ্ধি করেছে এবং মানুষকে হিংস্র করে গড়ে তুলছে।

আরিয়ান সভ্যতা

আরিয়ান সভ্যতার কথাই ধরুণ, এ সভ্যতা যেখানেই গিয়েছে মৌরুসী আভিজাত্যের ধারণা সাথে করে নিয়ে গেছে। ইরানেও এ মতবাদের ধারক ছিল আর হিন্দুস্তানে আসার সময়ও একই ধারণা সাথে নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টিতে ব্রাহ্ম ন হচ্ছে অভিজাত সম্প্রদায় এছাড়া বাকী সকল শ্রেণীর লোক হচ্ছে নিকৃষ্ট ও স্বল্পমর্যাদাসম্পন্ন। আরিয়ান সভ্যতা পরিষ্কার মানুষে মানুষে ভেদাভেদের প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে, মানুষকে তারা কোন গুণের ভিত্তিতে বিভক্ত করেনি এ ভেদাভেদ ছিল মানুষের সহজাত, এখানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মানুষ উচ্চ মর্যদা লাভ করতে সক্ষম নয়। ক্ষুদ্রজাতির মানুষ কোনদিন আপন চেষ্টায় ব্রাহ্মনে উন্নীত হতে পারে না। আর না এক জাতি অণ্য জাতিতে রূপান্তিরিত হতে পারে। এ সভ্যতার দৃষ্টিতে কতেক মানুষ জন্মগত ভাবেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার আর কতেক মানুষ জন্মসূত্রেই নিকৃষ্ট ও অধম।

হিটলারের দাবী

হিটলারের নীতিও ছিল তাই। সে দাবী করেছিল যে, জার্মান জাতি হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট জাতি তার মর্যাদা হচ্ছে সবার উপরে।

মৌরুসী শ্রেষ্ঠত্বের এ ধারণা ইয়াহূদী মানসিকতাতেও কানায় কানায় পরিপূর্ণ, তাদের আইন অনুসারে জন্মগতভাবে ইস্রাইলী নয় সে কিছুতে ইস্রাইলীদের অধিকার ভোগ করতে পারে না। তাদের দৃষ্টিতে ইয়াহূদীদের জন্যে 'তালমূদে' এতটুকু পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে যে, কোন ইস্রাইল ও অ-ইস্রাইলের মধ্যে বিরোধ দেখাদিলে সকল অবস্থায় ইস্রাইলীকেই সমর্থন দিতে

হবে। অনুরূপ ইউনানী বা গ্রীকদের মধ্যেও একই ধরণের জাতির অহংকার বিদ্যমান। তাদের দৃষ্টিতে সকল অ–গ্রীকই অধম ও নিকৃষ্ট।

পাশ্চাত্যের নিকৃষ্ট মানসিকতা

এ মনোভাব পাশ্চাত্যের মানসিকতাতেও সঞ্চারিত হয়েছে। পাশ্চাত্য জগত শ্বেতাংগের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় ভুগছে। তারা মনে করে যে, তারা কৃষ্ণাংগের চাইতে শ্রেষ্ঠজাতি। এ অন্তসারশূন্য অহংকারেরই ফলে বর্তমানে গোটা বিশ্ব জুলুম ও অত্যাচারের মাঝে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এ বর্ণ ভিত্তিক অহংকারের কারনেই গোটা বিশ্বে আজ অকথ্য জুলুম ও অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাসীদের এ ভ্রান্ত মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি হলো যে, তারা কৃষ্ণাংগদেরকে আফ্রিকা থেকে ধরে নিয়ে এসেছে এবং এখানে তাদেরকে বিক্রি করেছে অতএব তাদের উপর জুলুম অত্যাচার চালানোর সংগত অধিকার আছে। তাদের দৃষ্টিতে একাজ অবৈধ নয়। অনুমান করা হচ্ছে যে, বিগত শতাব্দীতে অন্ততঃ দশ কোটি মানুষকে এভাবে দাস বানানো হয়েছে এবং তাদের সাথে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে তাদের মাত্র চার কোটী মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে। দক্ষিণ আফ্রীকা এবং রোডেশিয়ায় আজও মানুষ মানুষের সাথে এধরণের নিষ্ঠুরতা অব্যাহত রেখেছে।

আঞ্চলিক জাতিয়তার নেশা

ভৌগোলিক জাতিয়তার (territorial nationalism) নেশাও একই শ্রেণীভুক্ত। এ বিদ্বেষের কারণেই পর পর দুটি বিশ্ব যুদ্ধ হয়ে গেছে। এ জাতি বিদ্বেষ কার্যতঃ প্রমাণ করেছে যে, সে মানুষের মধ্যকার পরস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় না করে মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয় নিয়ে যায়। এতে মানুষ হিংস্র

জন্তুতে পরিণত হয়। এটা জানা কথা যে, কাল চামড়া বিশিষ্ট মানুষ সাদা হতে পারে না। আর বিদেশী রাতারাতি দেশী মানুষেও রূপান্তরিত হতে পারে না। মানুষের জন্মভূমি পরিবর্তন করাও কিছুতেই সম্ভব নয়। মানুষ যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেছে সে দেশই হচ্ছে তার জন্মভূমি।

স্বয়ং আরবেও একই অবস্থা ছিল। গোত্রীয় বিদ্বেষ তাদের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত ছিল। প্রত্যেক গোত্রের লোক নিজেকে অন্য গোত্রের লোকের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। অপর গোত্রের মানুষ যতই সৎ ও যোগ্য হউক না কেন সে তার গোত্রের একজন অসৎ অযোগ্যের চাইতে বেশী কদর পেত না। মহানবী (সঃ) এর বর্তমানে 'মুসাইলেমা কায্‌যার' মাথা তুললে তার গোত্রের লোকেরা বলে যে, আমাদের কাছে আমাদের মিথ্যাবাদীও কোরাইশদের সত্যবাদীর চাইতে শ্রেষ্ঠ।

মহানবী (সঃ) এর আহ্বান

যেখানে বংশ, বর্ণ ও গোত্রের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল সেখানে মহানবী (সঃ) মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্বোধন করেছেন। আরবকে তিনি আরবী হিসেবে সম্বোধন করেননি তাঁর আহ্বান আরব কিংবা এশিয়ার পতাকা সমুন্নত করার জন্যে ছিল না। মানুষকে তিনি এই বলে আহ্বান করেছেন 'হে মানুষ আমি তোমাদের সবার কাছে প্রেরিত হয়েছি।'

তিনি যে বাণী পেশ করেছেন তা হচ্ছেঃ-"হে মানুষ সম্প্রদায়! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন কবিলা ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন, তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার।" আল্লাহ্‌র কাছে সেই শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত যে তাকে সব চাইতে বেশী ভয় করে।

তিনি বলেছেন যে, সকল মানুষ একই বংশোদ্ভুত। তারা একই মা-বাপের বংশধর। এ হিসাবে পরস্পর ভাই ভাই। বংশ, বর্ণ ও ভৌগলিকতার ভিত্তিতে

তাদের মাঝে কোন ভেদাভেদ নাই। কেবল পরিচয়ের জন্যেই তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অর্থাৎ এখানে যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন তা হচ্ছে কেবল পরিচয়েরই জন্যে। বাস্তবে এ ছাড়া আর কোন মর্যাদা স্বীকৃত নয়। কয়েকটি পরিবার একত্রে বসবাস করলে জনপদ গড়ে উঠে। বিভিন্ন জনপদ মিলেই মানুষের স্বদেশ গঠিত হয়। এ গুলো হচ্ছে একে অন্যকে জানার জন্যে। আল্লাহ্ মানুষের ভাষায় যে পার্থক্য রেখেছেন তাও কেবল পরিচয়ের জন্যে। এ পার্থক্য রাখা হয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার (Co-operation) জন্যে। ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের জন্যে নয়।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা

বর্তমান বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা হচ্ছে বর্ণভিত্তিক। এ ধারণা হচ্ছে কালো কিংবা সাদার ভিত্তিতে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এর ভিত্তিতে যে কে কত বেশী সৎ কাজ করে। কে কত বেশী আল্লাহ্‌কে ভয় করে। এখানে মানুষকে বিচার করা হয় যে, কে এশিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেছে আর কে ইউরোপে? মহানবী (সঃ) বলেছেন যে এটা কোন বিচার্যই নয়। আসল বিচার্য বিষয় হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্র। দেখতে হবে যে, কে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আর কে ভয় করে না। কারো আপন ভাইও যদি খোদাদ্রোহী হয় তা হলে সে শ্রদ্ধার যোগ্য হতে পারে না। আর হাজার হাজার মাইল দূরের কোন গোত্রের লোকের অন্তরে যদি খোদাভীতি থাকে তা হলে মুসলমানের দৃষ্টিতে সেও শ্রদ্ধার যোগ্য হবে। তার গায়ের রং যেমনই হউক না কেন।

মধ্যম পন্থী উম্মত গঠন

মহানবী (সঃ) প্রচলিত অর্থে-কোন দার্শনিক ছিলেন না যে, দর্শন পেশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তিনি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি উম্মত গঠন করেছেন এবং বলেছেন-

جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

"উম্মতে ওয়াসাত মানে এমন একটি জাতি যে জাতি পক্ষপাতিত্বের কারণে কারো শত্রু কিংবা বন্ধু নয়।" তার মর্যাদা হচ্ছে এমন একজন বিচারকের যে, সর্বাবস্থায় নিরপেক্ষ থাকে। সে কারো এমন বন্ধুও নয় যে, পক্ষপাতিত্ব করবে আর এমন শত্রুও নয় যে, বিরোধিতা করতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। তার ছেলেও যদি অপরাধ করে তখন তাকে শাস্তি দিতেও সে দ্বিধাবোধ করবে না। বিচারকের এ মর্যাদা গোটা উম্মতকে দেয়া হয়েছে। এর মানে হচ্ছে এই যে, গোটা মুসলিম জাতি হচ্ছে একটি ন্যায়নিষ্ঠ জাতি।

এখন দেখতে হবে যে, এ ন্যায়নিষ্ঠ জাতি কিভাবে গঠিত হয়? এ জাতি কোন গোত্রের ভিত্তিতে গঠিত হয় না কোন বংশ কিংবা ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতেও গঠিত হয় না। এজাতি কেবল মাত্র একটি কলেমার ভিত্তিতে গঠিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তার রসূলের নির্দেশ মেনে নাও এরপর যে দেশেই জন্মগ্রহণ কর না কেন তোমাদের গায়ের রং যাই হউক না কেন, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই, এ ভ্রাতৃসমাজে যে কেউ যোগদান করবে তাদের সবার অধিকার সমান হবে। এখানে সাইয়েদ ও শেরে মাঝে কোন পাথক্য নেই না কোন অনারবের উপর আরবের প্রধান্য স্বীকৃত। একালেমার সাথে যারাই একমত হবে তারা সবাই সমান। এজন্যেই মহানবী (সঃ) ঘোষণা করেছেন যে, 'কোন অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর না কোন আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। কোন কালোর উপর সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই আর না শ্বেতাংগের উপর কৃষ্ণাংগের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। তোমরা সবাই আদমেরই বংশধর আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে সেই বেশী সম্মানিত যে খোদাকে সবচাইতে বেশী ভয় করে।

ন্যায় বিচারের একটি দৃষ্টান্ত

এ কথাটি আমি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করবো। বনি মুস্তালিকের যুদ্ধে মুহাজির ও আনসার উভয়েই শরিক ছিলো। ঘটনাক্রমে উভয় কবিলার মধ্যে পানি নিয়ে বিবাদ দেখা দেয় সাহায্যের জন্যে মুহাজিররা মুহাজিরদেরকে ডাক দেয় আর আনসাররা ডাকে আনসারদেরকে। এ থরনের ডাকাডাকি শুনে মহানবী (সঃ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন– এ আবার কি ধরণের জাহেলী ডাক? "এ ধরণের অপ্রীতিকর ডাকাডাকি বন্ধ কর"। এ কথার দ্বারা মহানবী (সঃ) এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মযলুমের ডাকে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা গোটা জাতির কর্তব্য। বিশেষ কোন গোত্র বা সাম্প্রদায়ের বিপদ কালে কেবল নিজের গোত্র বা সমাজের লোকদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকা জাহেলিয়াতেরই রীতি। মযলুমের সাহায্যে এগিয়ে আসা আনসার মুহাজির নির্বেশেষে সবার

কর্তব্য, যালেম বা অত্যাচারী যদি কারও আপন ভাইও হয় তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তার ভাইয়েরই প্রথম কর্তব্য নিজের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ডাকা ইসলামের রীতি নয় এটা জাহেলিয়াতেরই রীতি। এজন্যেই ইসলাম বলেছে--

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী হও।

মানুষের অন্তর রাজ্য জয় করার গুণ

এ উম্মতের সদস্যদের মধ্যে বিলালে হাবশী ও সালমান ফারসী এবং সোহাইব রুমীও ছিলেন এ সার্বজনীন বৈশিষ্টের কারণেই গোটা ইসলামের

সামনে পদানত হয়েছে। সত্যপন্থী খলিফাদের আমলে একের পর এক রাজ্য জয় হতে থাকে। এ বিজয়ের কারণ এই যে, তাঁরা যে নীতি ও আদর্শ তুলে ধরেছেন তার সামনে কেউ টিকে থাকতে পারেনি। অন্ধকার যুগে যেমন আরবে উচ্চ নীচের ভেদাভেদ ছিল ঠিক ইরানেও তাই ছিল। ইরানীরা মুসলমানদেরকে একই সারিতে দাঁড়াতে দেখলে স্বয়ং তাদের অন্তরও বিজিত হয়। অনুরূপ মুসলমানরা মিসরে পৌঁছে সেখানেও নিজেদেরকে এ অপরাজেয়বিস্ময়কর শক্তি প্রদর্শন করেছে, সার কথা মুসলমানরা যেখানেই গিয়েছে মানুষের অন্তর জয় করে অগ্রসর হয়েছে। এ বিজয়ে তলোয়ারের ভূমিকা ছিল মাত্র শতকরা এক ভাগ আর নিরানব্বই ভাগই ছিল সাম্য ও ন্যায়ের।

বর্তমানে বিশ্বে এমন কোন ভূখণ্ড নেই যেখানে মুসলমান নেই। হজ্জ উপলক্ষে প্রত্যেক দেশের মুসলমানরা এক হেজাজ ভূমিতে সমবেত হয়, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এ অপূর্ব দৃশ্য দেখে আমেরিকার নিগ্রো মুসলমান নেতা মিলকম এক্স মন্তব্য করেছে, এছাড়া জাতিভেদ সমস্যার অন্য কোন সমাধান নেই।' একমাত্র এ নীতিরই ভিত্তিতে গোটা বিশ্বের মানুষ একত্রিত হতে পারে। একথা পরিষ্কার যে, মানুষ যেখানোই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন সে তার জন্মভূমি পরিবর্তন করতে সক্ষম নয় কিন্তু কোন একটি নীতি তো গ্রহণ করতে সক্ষম। মহান্‌বী (সঃ) মানুষকে এমন একটি কলেমা দিয়েছেন যার ভিত্তিতে তারা একত্রিত ও হতে পারে এবং একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রও কায়েম করতে পারে।

মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ

মুসলমানরা যখনই এ নীতি থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে তখনই তাদের উপর মার পড়েছে। স্পেনে মুসলমানরা আট'শ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছে সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত হওয়ার কারনই ছিল গোত্রীয় বিদ্বেষ ও পারস্পরিক কলহ বিবাদ। এক কবিলা অপর কবিলার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং পারস্পরিক যুদ্ধ বাধিয়েছে। ফল এই হয়েছে যে, সেখানে মুসলমানদের

শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, সেখানে মুসলমানদের শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং বর্তমানে সে দেশে মুসলমান দুর্লভ। হিন্দুস্তানেও মুসলমানদের শক্তি কি করে শেষ হয়েছে? তাদের মধ্যেও সেই জাহেলিয়াতের বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। কেউ মুগল হওয়ার কারণে গর্ব করত আর কেউ পাঠান হওয়ার। ফল এই হয়েছে যে, প্রথমে তারা মারাঠীদের হাতে মার খেয়েছে পরে শিখদের হাতে। সর্বশেষে ছয় হাজার মাইল দূর থেকে এক অপরিচিত জাতি এসে তাদের উপর শাসক হয়ে চেপে বসেছে।

এ শতকে তুর্কীদের বিশাল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছে। আরবরা তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা নিজেদের জমা খরচ অনুসারে স্বাধীনতা অর্জন করছিল। কিন্তু বাস্তবে উসমানীয় সাম্রাজ্যের যে খণ্ডটিই তুর্কীদের হাত ছাড়া হতো তা হয়ত ইংরেজদের ঝুলিতে গিয়ে পড়তো কিংবা ফরাসীরা তা লুফে নিতো।

মুসলমানরা মুসলমানদের চিবিয়ে খাচ্ছে

বর্তমানেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আরবরা আরবদেরকেই চিবিয়ে খাচ্ছে। ইয়ামেনের গৃহ যুদ্ধে আড়াই লক্ষ আরব নিহত হয়েছে। আরব ইসরাইল যুদ্ধে একই কারণে আরবদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। একই ভাষাভাষী একই বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও একে অন্যের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগেছে। জর্দান, সিরিয়া ও লেবানন প্রথমে '৪৮ সালে মার খেয়েছে। অতঃপর' ৫৬ সালে মার পড়েছে। এর পর ৬৭ সালে আবার মার খেয়েছে। অথচ এ সকল দেশ ও মিশর ঐক্যবদ্ধ হলে জনসংখ্যা ও আয়তনে ইস্রাইলের চাইতে কয়েক গুণ বড় হবে।

ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, মুসলমানরা যখন এক কালেমার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ছিল তখন তারা ছিল অপরাজেয়। কিন্তু যখনই বংশ বর্ণ ও ভৌগলিকতার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হয়েছে তখনই তারা মার খেয়েছে।

এবং ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। স্পেনের মত বিশাল সাম্রাজ্য একই কারণে মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়েছে। এ কারণেই হিন্দুস্তানেও তারা মার খেয়েছে। একই কারণে মধ্যপ্রাচ্যে তারা পরাজয় বরণ করেছে।

মহানবী (সঃ) এর সীরাত অনুসরণ করুন

সীরাত সম্মেলন অবশ্যই করতে থাকুন। মহানবী (সঃ) এর স্মরণ করার চাইতে [illegible] কাজ আর নেই। কিন্তু এটা যেন প্রাণহীন স্মরণ ও (lip-service) ই না হয়। সীরাতের শিক্ষা অনুসারে কাজ করুন, দেখবেন মহানবী (সঃ) এর অনুসারীদের জন্যে যে রহমত নির্ধারিত আছে তার অংশ ও পাবেন। হাদীস শরীফে এ জন্যেই বলা হয়েছে যে,

اَلْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ

"কোরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষ্য", যে জাতি কোরআন অনুসরণ করবে কোরআন তার পক্ষে সাক্ষী দেবে আর যে, কোরআনকে সত্য জেনে সচেতন ভাবে অমান্য করবে তখন কোরআন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। একথাটিকে আমরা এভাবে বুঝতে পারি, যে এক ব্যক্তি আইন সম্পর্কে অবগত আর অপর ব্যক্তি অনবগত। আইন জানা সত্ত্বেও যে আইন অমান্য করে স্বয়ং আইন তার বিরুদ্ধে সাক্ষীর ভূমিকা পালন করে। এক কালেমার ঝাণ্ডা সমুন্নত করুন তখন দেখতে পাবেন যে, কেবল আমাদের দেশই মজবুত হবে না বরং পূর্ব পশ্চিম আমাদের পদানত হবে। আর আল্লাহ্‌র কালেমা ত্যাগ করে জাতিয়তাবাদের পেছনে ধাবিত হলে বিশ্বে আমাদের কোন মর্যাদা থাকবে না।

আল্লাহ্‌ আমাদেরকে মহানবী (সঃ) এর যথার্থ উম্মত হওয়ার তৌফিক দিন! আমীন।

[১৯৬১ সালের জুন ও জুলাই মাসে ঢাকা ও খুলনায় অনুষ্ঠিত সীরাত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।]

অনন্য মহাবিপ্লবের নায়ক

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সঃ) এর ব্যক্তিত্ব অতি বৃহৎ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্তকার সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও মহামনীষী (Herows) হিসেবে পরিচিতদেরকে তাঁর সামনে অত্যন্ত খাটো দেখায়। বিশ্বের ইতিহাসে এমন কোন মনীষীর সন্ধান মেলেনা যার সাফল্যজনক জীবনাদর্শ মানব জীবনের দু'একটি বিভাগের বেশী অতিক্রম করতে পেরেছে। কেউ মতবাদের রাজ্যে একক সম্রাট হলেও কার্যক্ষেত্রে একান্ত দুর্বল অনেকেই আবার আমলের জীবন্ত প্রতীক হলেও বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার বিচারে একান্তই সীমাবদ্ধ কেউ আবার অনন্যসাধারণ সেনানায়ক। কারো দৃষ্টি সমাজ জীবনের কোন একটি দিক ও বিভাগের এত গভীরে যে, জীবনের অন্যান্য দিক গুলো তার দৃষ্টির বাইরে থাকে। কেউ আবার বৈষয়িকতার জালে আবদ্ধ হয়ে নৈতিকতাও আধ্যাত্মিকতাকে একেবারে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। মোটকথা ইতিহাসের মনীষীরা জীবনের কোন একটি দিকে কৃতিত্ব করেছে।

একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন আমাদের মহানবী (সঃ) তাঁর জীবনে সকল প্রকার গুণের পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছে। একই সংগে তিনি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক এবং প্রয়োগিক ছিলেন। নিজের উপস্থাপিত দর্শনকে তিনি নিজেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। একসঙ্গে তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ এবং সেনানায়ক ছিলেন। তিনি কেবল আইনই রচনা করেননি বরং মানুষকে নৈতিকতাও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল গোটা মানব জীবনের উপর, জীবনে খুঁটিনাটি বিষয়াদিতেও তিনি হেদায়াত দেন। পানাহারের আদব-কায়দা ও শরীরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পদ্ধতি থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি হুকুম আহকামও অনুশাসন দিয়েছেন, নিজের দেয়া মতবাদের ভিত্তিতে তিনি একটি স্থায়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতি (Civilization) গড়ে তুলে দৃষ্টান্ত স্থাপন

করেছেন। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের সাথে এ সভ্যতার এমন নিখুঁত সমতা (Equilibrium) বিধান করেছেন যে, কোথাও অসংগতির চিহ্নমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না, এখন প্রশ্ন হলো যে, এ ধরণের পরিপূর্ণ জীবন বিধান পেশ করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়েছে কি? না বিশ্বে এমন কোন ব্যাক্তিত্ব নেই যে, যুগের পরিবেশের কাছে ধনী নয়। কিন্তু মহানবী (সঃ) এর মর্যাদা স্বতন্ত্র। তিনি কোন যুগের পরিবেশের কাছে ঋনী নন। এ মর্যাদা লাভ করার ব্যাপারে তিনি কোন যুগ ও পরিবেশের সাহায্য গ্রহণ করেননি। কেউ যুক্তিদিয়ে এটা দেখাতে পারবে না যে, ঐতিহাসিকভাবে তৎকালীন আরবের পরিবেশ তাঁর মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের অনুকুল ছিল। বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিক কারণ ও পরিণতিতে তৎকালীন আরবে এমন একজন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন অনুভব হচ্ছিল যে, গোত্রীয় কলহ ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে, সবাইকে একপতাকা ঐক্যবদ্ধ করে বিভিন্ন দেশ জয় করে আরবের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করবে। মোটকথা এমন একজন জাতিয়তাবাদী নেতার প্রয়োজন ছিল যার মধ্যে তৎকালীন আরবের সকল প্রকার বৈশিষ্ট থাকবে যে, স্বৈরাচার জুলুম অত্যাচার খুনখারাবী ধোকা প্রতারণা অর্থাৎ সে কোন কৌশলে স্বজাতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। এবং একটি সাম্রাজ্য গঠন করে তার উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দিতেপারে। ঐতিহাসিক পরিণতি হিসেবে তৎকালীন আরবের অন্য কোন দাবী ছিল বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবেনা। হেগেলের ইতিহাস দর্শন ও মার্ক্সের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার আলোকে বড়জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তৎকালীন পরিবেশে ঐজাতিতে উল্লেখিত গুণ বিশিষ্ট একজন নেতার আবির্ভাব ও একটি সাম্রাজ্য আবশ্যক ছিল। আর পরিবেশও ঐ ধরণের নেতার আবির্ভাবের অনুকুল ছিল। কিন্তু বাস্তবে যা হয়েছে হেগেল কিংবা মার্ক্সের দর্শনে তার ব্যাখ্যা কি আছে? উল্লেখিত পরিবেশে এমন এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্র শিক্ষাদানকারী, মানবতার উৎকর্ষ সাধক, আত্মার পরিশুদ্ধিকারক ও অন্ধকার এবং অন্ধাকার যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্নাদের বিদ্বেষের অবসানকারী তাঁর দৃষ্টি জাতি, বংশ, বর্ণ ও ভৌগোলিক সীমারেখা ধুলিস্যাৎ করে গোটা মানব সমাজের

উপর প্রস' · হয়েছে। তিনি স্বজাতির স্বার্থের উর্ধে থেকে গোটা মানবতার জন্যে নৈতিক আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। অর্থনৈতিক বিষয়াদী রাজনৈতিক শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কাদীকে কল্পলোকে কায়েম না করে নৈতিকতার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং আধ্যাত্মিকতা ও বৈষয়িকতার মাঝে এমন সংগতি সমন্বয় ও ভারসাম্য বিধান করেছেন যা আজ যেমন প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে প্রোজ্জ্বল অতীতেও ঠিক তেমনিই ছিল। এ মহাগুণধর ব্যক্তিত্বকে আরব পরিবেশের সৃষ্টি বলা সংগত হবে না, মহানবী (সঃ) যে, সকল যুগ ও পরিবেশের উর্ধে ছিলেন কেবল তাই নয় বরং তাঁর কৃতিত্ব বিচার করলে দেখা যায় যে, তিনি স্থান ও কালের সীমার উর্ধে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি শতাব্দি ও সহস্রাব্দের **(Millennium)** সীমা অতিক্রম করে চলে। তিনি সর্বকালের ও সর্ব যুগের পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ নৈতিক আদর্শিক ও ব্যবহারিক হেদায়েত দিয়েছেন। তিনি ঐ সকল মনীষীদের দলভুক্ত নন যাদেরকে ইতিহাস অতীতে স্থান দিয়েছে । যাদের প্রশংসা কেবল এ হিসেবে করা যায় যে, এককালে তাঁরাও শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক ছিলেন মহানবী (সঃ) সবটাই স্বতন্ত্রধর্মী পথ প্রদর্শক। তিনি ইতিহাসের সাথে গতিশীল প্রত্যেক যুগেই তিনি সর্বাধুনিক রূপে গণ্য হন। তিনি অতীতে যেমন সর্বাধুনিক ছিলেন বর্তমানেও সর্বাধুনিক রূপে গণ্য হন। তিনি অতীতে যেমন সর্বাধুনিক ছিলেন বর্তমানেও সর্বাধুনিক উদারতা বশতঃ যাদেরকে আমরা ইতিহাস স্রষ্টা **(Maker of History)** বলে মনেকরি প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ইতিহাসেরই সৃষ্টি **(Creature of Hisktory)** বস্তুতঃ গোটামানবতার ইতিহাসে, ইতিহাস স্রষ্টা তো মাত্র একজন। ইতিহাসে বিপ্লব সৃষ্টিকারী নেতৃবৃন্দের কৃতিত্ব বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক যুগ সন্ধিক্ষণেই কোন না কোন বিপ্লবের জন্যে ক্ষেত্র তৈরী ছিল। আর বিপ্লবের কারণই স্বয়ং তার পথ ও গতি নির্ধারণ করতো। বিপ্লবের নায়করা কেবল যোগ্যতার ভিত্তিতে ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরিবেশ মোতাবেক চাহিদা পুরণের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে সক্রীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর জন্যে আগে থেকেই মঞ্চ নির্ধারিত ছিল। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের নায়কদের

মাঝে আমাদের মহানবী (সঃ) ই একমাত্র ব্যতিক্রম। কারণ তাঁর জন্যে পূর্বথেকে বিপ্লবের উপাদান মওজুদ ছিল না। তিনি নিজেই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে উপাদান দিয়েছেন। যে যে ক্ষেত্রে উপাদানের অভাব ছিল সে সে ক্ষেত্রে তিনি উপাদান গঠন করেছেন। যাদের মধ্যে বিপ্লবের প্রাণশক্তি কার্যকরী করার যোগ্যতার অভাব ছিল তাঁদেরকে তিনি নিজ হাতে মনেরমত করে গড়ে তুলেছেন। নিজের সুবিশাল ব্যক্তিত্বকে ঢালাই করে হাজার হাজার ব্যক্তিত্ব তৈরী করেছেন। এ সকল কর্মীদেরকে তিনি মনের মত করে গড়ে তুলেছেন। তাঁর মনোবলও ইচ্ছাশক্তিই বিপ্লবের উপাদান যুগিয়েছে। তিনি নিজেই বিপ্লবের গতিবিধি ও পন্থা নির্ধারণ করেছেন। নিজের ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে তিনি যে পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন সে পথেই চালাতে সক্ষম হয়েছেন। এমন সুমহান ব্যাক্তিত্ব, এত সুউচ্চ মর্যাদাশীল ও ইতিহাস সৃষ্টিকারী মহাবিপ্লবের অধিনায়ক মানব জাতির ইতিহাসে আর কে আছে?

[তাফহীমাত ৪র্থ খণ্ড থেকে

ইন্নাকা'লা আ'লা খুলুকিল আ'যীম

আল্লাহ্‌র গুণাগুণ ও মহিমা বর্ণনা করার পর একমাত্র মহানবীর (সঃ) জীবনালোচনাই সর্বাধিক শুভ ও পবিত্রতম সংক্ষেপে কেবল এতটুকু বলতে চাই যে, পবিত্র কোরআনে মজীদে মহানবী (সঃ) নবুয়তের পক্ষে যে সকল দলিল পেশকরা হয়েছে তার মধ্যে তাঁর (সঃ) আখলাক ও চরিত্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল হিসেবে উত্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ○

তাঁর নবুয়ত অস্বীকারকারীদের সামনে মহানবী (সঃ) আদর্শ চরিত্রকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই নির্মল নিখুঁত চরিত্রবান ব্যক্তিকে কি করে তোমরা অস্বীকার করতে পার? বস্তুতঃ যে কেউ নিরপেক্ষ

ভাবে মহানবীর (সঃ) জীবন চরিত্র আলোচনা করবে তার অন্তর স্বতঃস্ফূর্ত সাক্ষ্য দেবে যে, এটা আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) ছাড়া অন্য কারো জীবন চরিত হতে পারে না।

আপনজনের সাক্ষ্য

মহানবী (সঃ) জীবন দুইটি বড় অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ নবুয়ত লাভের চল্লিশ বছরে পরিব্যাপ্ত আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে নবুয়ত লাভের পরের ২৩ বছর। নবুয়ত লাভের পরের অংশের প্রথম তের বছর আবার মক্কা শরীফে অতিবাহিত হয়েছে বাকী দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে মদীনা মুনাওয়ারায়। নবুয়ত লাভের পূর্বের চল্লিশ বছর সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে নবুয়তের কথা ঘোষণা করার পর সর্বপ্রথম যাঁরা তাঁর ওপর ইমান এনেছেন তারাই সবচাইতে বেশী তাঁর চরিত্র নিরীক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। এরা হচ্ছেন হযরত খদীজা (রাঃ) ও হযরত যায়েদবিন হারেসা (রাঃ) এঁদের মধ্য থেকে কেবল হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে কোন ইসলাম বিরোধী হয়ত যুক্তি দিতে পারে যে, তিনি ছিলেন মাত্র দশ বছরের কিশোর। মহানবী (সঃ) তাঁকে লালন পালন করছিলেন, অতএব অভিভাবকের ওপর ইমান আনাটা তেমন বড় কথা নয়, কিন্তু হযরত খদীজা (রাঃ) তো ৫৫ বছর বয়স্কা মহিলা ছিলেন এবং দীর্ঘ পনর বছর থেকে মহানবীর জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। স্বামীর স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ, ও মন-মেজাজ সম্পর্কে স্ত্রীর চাইতে বেশী ওয়াকিফহাল আর কেউ হতে পারে না। হযরত খদীজা (রাঃ) সম্পর্কে একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, তিনি কোরাইশ বংশের একজন বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা মহিলা ছিলেন। দীর্ঘ পনর বছর যাবৎ মহানবীর (সঃ) সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার পর মহানবী (সঃ) সম্পর্কে তাঁর যে কি অভিমত ছিল তা কেবল এ কথার দ্বারাই আন্দাজ করা যেতে পারে যে, মহানবী (সঃ) যখন তাঁকে

জানান যে 'আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আমার কাছে অহী আসে'। তখন শোনামাত্রই তিনি বিশ্বাস করেন এবং বলেন, 'সত্যই আল্লাহ্‌ আপনাকে নবী নির্বাচন করেছেন।' তিনি বিশ্বাস করেন যে, এ ধরনের উন্নত স্বভাব চরিত্র ও আখলাক নৈতিকতা বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন দাবী করেছেন যে, তাঁর কাছে অহী আসছে তখন ঠিকই বলছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তিনি মহানবীর (সঃ) প্রায় সমবয়সী ছিলেন। তাঁর থেকে মাত্র দুই বছরের ছোট ছিলেন। তিনি ছিলেন মহানবীর পুরানো বন্ধু ও সাথী। বন্ধুকে বন্ধুর চাইতে কেউ জানার কথা নয়। এক বন্ধু অপর বন্ধুর ভাল মন্দ ও দোষ ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। নবী (সঃ) তাঁর সামনেও যখন একথা রাখেন 'যে, আল্লাহ্‌ তাঁকে নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।' তখন তিনিও তা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেন এবং বলেন--সত্যই আপনি আল্লাহ্‌র নবী (সঃ)। তার মনে এক মুহূর্তের জন্যেও এব্যাপারে কোন সংশয় জাগেনি। এর মানে এই যে নবুয়ত লাভের পুর্বে তাঁর জীবন অত্যন্ত পুত-পবিত্র ছিল এবং তাঁর স্বভাব চরিত্র এত উন্নত ছিল যে সত্যই তিনি নবুয়তের মর্যাদা লাভ করেছেন।

তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ)। তিনি ছিলেন পরিণত বয়সের মানুষ। দীর্ঘ দিন ধরে মহানবীর (সঃ) ঘরে সেবকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। গৃহভৃত্য কিংবা ঘরের কর্মচারী গৃহস্বামীর জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে অবগত থাকে। মানুষের জীবনের দোষগুণ কোন কিছুই তাঁর কাছে লুকায়িত থাকে না। অতএব, হযরত যায়েদও তাঁর (সঃ) মুখে নবুয়তের দাবী শোনা মাত্রই বিশ্বাস করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌ যখন তাঁকে (সঃ) নবী নিযুক্ত করেছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি নবুয়তের যোগ্যতা রাখেন।

শত্রুর আচরণে নবুয়তের পক্ষে সাক্ষ্য

মহানবী (সঃ) নির্মল ও নিষ্কলংক আখলাখ ও নৈতিকতার সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। এটা এমন এক অটল সত্য যার প্রমাণ তাঁরা (সঃ) নিকৃষ্টতম শত্রুর আচরণেও বিদ্যমান। মহানবী (সঃ) নবুয়তের দাবী করলে তাঁর

নিকৃষ্টতম কোরাইশ সরদারও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ তোলেনি। বস্তুত তাঁর নির্মল জীবন এবং নিষ্কলংক চরিত্রে উচ্চতম বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাঁর শত্রুরা তাঁকে (সঃ) কবি, যাদুগর ইত্যাদি হাস্যকর বিশেষণে বিশেষিত করলেও তাঁর (সঃ) চরিত্র সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ তোলেনি।

কালের সাক্ষ্য

আর একটি কথা প্রনিধান যোগ্য। নিঃসন্দেহে নবুয়ত লাভের পূর্বেকার তার চল্লিশ বছরের জীবন একান্ত পুত–পবিত্র ছিল। এবং তিনি উচচতম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু নবুয়তের দাবীর একদিন পূর্বেও তিনি নবুয়তের প্রস্তুতি করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। তার একদিন পূর্বেও কেউ তাঁর মুখে এ ধরণের কোন কথা শোনেনি। তাঁর কোন আচার আচরণ ও আভাস ইংগিতেও কারো সামনে এ কথা ব্যক্ত হয়নি যে কোন একদিন তিনি ধর্মনেতা হওয়ার দাবী করতে পারেন। তাঁর (সঃ) শত্রুরাও তাঁকে (সঃ) এই বলে অভিযুক্ত করতে পারেননি যে 'জনাব আপনিতো পূর্ব থেকেই নবুয়তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। অতএব, আপনার এ দাবীর উদ্দেশ্য আমাদের অজানা নয়'।

পরিবেশ ও পরিস্থিতি সাক্ষ্য

আর একটি কথা চিন্তা করে দেখুন। নবুয়ত লাভের পর মহানবী (সঃ) মক্কাশরীফে যে তেরটি বছর অতিবাহিত করেছেন সে সময়ের মধ্যে তাঁর নিজস্ব গোত্র ও জাতির কতক মানুষ তাঁর উপর ইমান এনেছে আর অনেকেই ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে। এ উভয় সম্প্রদায়ের আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারাই মহানবী (সঃ) উপর ঈমান এনেছে যাদের মাঝে তাঁর চল্লিশটি বছর অতিবাহিত হওয়ার কারনে তাদের সামনে তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও

গোপন ছিল না। এটা জানা কথা যে, দেশের বাইরে গিয়ে মানুষ নিজের মহিমা প্রচার করতে পারে এবং মানুষকে তাঁর ভক্তও করে নিতে পারে কিন্তু যে জনপদে মানুষ তার শৈশব ও যৌবন অতিক্রম করে বার্ধক্যে পা রেখেছে সেখানকার মানুষ তাঁর পবিত্রতম জীবন স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত তার কথা মানতে রাজী হতে পারেনা এবং তাকে সত্যিকার নবী বলে বিশ্বাসও করবে না।

মহানবীর (সঃ) ওপর ঈমান আনয়ণকারীরা যেহেতু তাঁকে নিঃখুঁত নির্মল চরিত্রবান হিসেবে দেখেছেন এ জন্যেই তারা মহানবীকে (সঃ) যথাযথই আল্লাহ্‌র নবী হওয়ার যোগ্য বলে বিশ্বাস করেছেন। তাদের বুঝতে দেরী হয়নি যে তাঁর মত নিখুঁত নির্মল স্বভাব চরিত্রের অধিকারী মানুষ আল্লাহ্‌র নবী না হয়ে যায় না।

দাওয়াত ও আচরণের অভিন্নতা

মহানবীর (সঃ) আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি ইসলামের শত্রুদের পাপ ও অন্যায় কাজের নির্দয় সমালোচনা করেছেন। আর সমাজ যে সকল পাপ পংকিলতা ও অন্যায় অনাচারে নিমজ্জিত ছিল তার মূলোৎপাটন করতেও চেয়েছেন এবং মানুষকে তিনি সৎ কাজের প্রতি আহ্‌বান করেছেন। কিন্তু একথা সবাইর জানা আছে যে, যারা তাঁর বিরোধীতা করেছে তাদের কোন একজনও একথা বলতে পারেনি যে, 'আপনি আমাদেরকে যে সকল অন্যায় অনাচার থেকে বারণ করেছেন তা আপনার জীবনেও তো বিদ্যমান। কিংবা 'যে সৎ কাজের প্রতি আমাদেরকে আহ্‌বান করছেন সে সৎকাজ আপনার জীবনে অনুপস্থিত কেন? কথা এখানেই শেষ নয়। তাঁর (সঃ) শত্রুদের উপর তাঁর উন্নত চরিত্রের কি যে প্রভাব ছিল একটি মাত্র ঘটনার দ্বারাই তা আন্দাজ করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে অসংখ্য দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে কিন্তু নমুনা হিসেবে এখানে মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি।

দাওয়াত প্রত্যাখানকারীর উপর ও তাঁর নিখুঁত চরিত্রের প্রভাব

একথা কার অজানা যে মক্কা শরীফে আবু জেহেল ছিল তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রু। একদিন মহানবী (সঃ) হেরেম শরীফের এক কোণে বসে আল্লাহ্‌র ধ্যান করছেন। অপর কোণে কোরাইশ সরদাররা মজলিস জমিয়েছে। এমন সময় মক্কার বাইরের একজন লোক ফরিয়াদ নিয়ে কোরাইশ সরদারদের সামনে হাজির হয়ে আর্জি পেশ করে যে, আবু জেহেল আমার উট ক্রয় করেছে কিন্তু টাকা দেয়ার সময় গড়িমসি করছে। আমি এখানে অপরিচিত মানুষ। এখানে আমার কোন আত্মীয়স্বজন নেই। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। আমার উটের মূল্য আদায় করে দিন। তার ফরিয়াদ শুনে কোরাইশ সরদাররা উপহাস ছলে মহানবী (সঃ) কে দেখিয়ে বলে-- ঐ যে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছ, তার কাছে যাও সেই তোমার টাকা উশুল করে দিতে পারে। বিদেশী লোকটি মহানবীর (সঃ) কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করে। কোরাইশ সরদাররা মজা করে মহানবীর প্রতিক্রিয়া দেখছিল। তারা দেখে তো অবাক যে, মহানবী (সঃ) লোকটিকে সাথে করে সোজা আবু জেহেলের বাড়ীর সামনে উপস্থিত।

শান্তি ও কল্যাণের নবী (সঃ)

সরদাররা একজন লোককে তাঁদের পিছনে পাঠিয়ে দেয়। মহানবী (সঃ) আবু জেহেলের দরজার কড়া নাড়েন। আবু জেহেল দরজা খুলে বাইরে এসে থোঁ 'থ' হয়ে যায়। তিনি (সঃ) আবু জেহেলকে লক্ষ্য করে বললেন-- তুমি এ বিদেশী লোকটির উট ক্রয় করেছ কিন্তু মূল্য দেয়ার বেলায় অনর্থক টাল বাহানা করছ। এখনই তার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আবু জেহেল কোন দ্বিরুক্তি না করে সোজা ঘরে গিয়ে টাকা এনে তার হাতে দিয়ে দেয়। এতেই বুঝা যায় যে, মহানবীর (সঃ) নিকৃষ্টতম শত্রুর উপরও তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। গোটা মক্কা শরীফে আবু জেহেলের কাজের সমালোচনা করারমত সাহস কারো ছিল না। কিন্তু মহানবী (সঃ) তার থেকে মযলুমের হক আদায় করেছেন। এর মানে হচ্ছে যে, তাঁর সামনে তাঁর শত্রুরও মাথা তোলার সাহস ছিল না। তিনি যদি নির্মল ও

নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী না হতেন তা হলে আবু জেহেলের মত নিকৃষ্টতম শত্রু সে দিকে অংগুলি নির্দেশ না করে থাকতে পারতো না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি সম্পূর্ণ রূপে নির্মল ও নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

ইতিহাসের একমাত্র দৃষ্টান্ত

আশ্চর্যের বিষয় যে মহানবী (সঃ) মদীনা শরীফে মোট দশ বছর বসবাস করেছেন। এ সময়ে আল্লাহ্ তাঁকে (সঃ) দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন। সমাজে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'তোমাদের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে মহানবীর (সঃ) জীবন। বলা হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রসূলের জীবনে আছে সর্বোত্তম নির্দশন।'

'কোনদেশে বা সমাজে সাধারন ঘোষণা দেয়া সহজ কথা নয় যে, এ লোকটি হচ্ছে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ? বস্তুত মহানবী (সঃ) তাঁর গোটা জীবনগ্রন্থ মানুষের সামনে উন্মুক্ত রেখেছেন। তাঁর জীবনের কোন কিছুই প্রাইভেট ছিল না। গোটা জীবনই ছিল পাবলিক লাইফ তিনি কেবল তাঁর জীবন দেখে তাঁর কথা শুনে তাঁর (সঃ) কাজকর্ম দেখে মানুষের কাছে বর্ণনা করারই অনুমতি দেননি বরং জীবন সংগীনীদের কাছেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানার অনুমতি দেন। এর মানে হলো যে গোটা দশবছর জনগণের সামনে তাঁর জীবন এমনভাবে উম্মুক্ত ছিল যে, জীবনের কোন একটি দিক ও বিভাগই মানুষের সামনে প্রচ্ছন্ন ছিল না। বস্তুত আল্লাহ্‌র নবী ছাড়া অন্য কোন মানুষের পক্ষে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। এটা এমন একটি কষ্টিপাথর যার সামনে নিখুঁত চরিত্রের মানুষ ছাড়া আর কারো পক্ষে টেকা সম্ভব নয়। অন্য কোন মানুষের পক্ষে এটা দাবী করা সম্ভবই নয় যে, তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি দিক ও বিভাগ এ কষ্টিতে যাচাই করলেও খাঁটি প্রমাণিত

হবে। কেবল যে, তার কোন ত্রুটি ধরা পড়বে না তা নয় বরং জীবনের যে দিকই পরীক্ষা করা হউক না কেন সকল দিকেই তিনি নিখুঁত ও পূর্ণাংগ মানুষ প্রমাণিত হবেন। এবং মানুষ স্বীকার করবে যে হাঁ, এ লোকটিই আমাদের জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ হ্যাঁ, গোটা মানব জাতির ইতিহাসে একমাত্র মহানবী (সঃ) ই এ মর্যাদার অধিকারী। দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন আদর্শতম স্বামী ও পিতা। ঘরের বাইরে ছিলেন সর্বোত্তম বন্ধু ও প্রতিবেশী। লেনদেনের ব্যাপারে ছিলেন সততার জীবন্ত প্রতীক, বিচারপতির আসনে একান্ত ন্যায়পরায়ন ও নিরপেক্ষ বিচারক। তাঁর জীবনে আনন্দ ও দুঃখ এসেছে, রাগ ক্রোধ এবং স্নেহ ভালবাসা থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁর মুখ থেকে সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী একটি বাক্যও কেউ শোনেনি। দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ মানুষ তাঁর কথা শুনেছে এবং একে অন্যের কাছে বর্ণনাও করেছে কিন্তু একটি কথাও সত্য এবং ন্যায়ের পরিপন্থী বর্ণিত হয়নি। এমনকি রাগের বশবর্তী হয়েও তিনি কারো জন্যে খারাপ বাক্য মুখে আনেননি। এ মর্যাদা লাভ কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

দুশমনেরও বন্ধু

আর একটি বিবেচ্য বিষয় যে, মাহনবীকে (সঃ) তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুর সাথেও যুদ্ধ করতে হয়েছিল কিন্তু, সব সময় তিনি শত্রুদের সাথেও ইনসাফমূলক ব্যবাহার করেছেন, কেবল ইনসাফই করেননি, তাদের ওপর দয়া করেছেন, বিখ্যাত ঘটনা, মক্কা জয় করার দিন তাঁর ঐ সকল শত্রুরাও তাঁর সামনে অসহায় অবস্থায় হাত জুড়ে মাথা নত করে দাঁড়ায় যারা দীর্ঘ তের বছর তাঁকে নানা প্রকার যন্ত্রনা দিয়েছিল এমনকি হিজরতের পরেও মদীনায় শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এবার মহানবী (মঃ) তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন। ঘোষণা করেন—

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অতএব কাউকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়া হয়নি কেবল যাদের সামরিক অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তাদেরকেই শাস্তি দেয়া হয়েছে। এ ধরনের অপরাধীর সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকজন। এছাড়া বাকী সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা

প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত শক্ত ছিলেন বারবার যারা তাঁর সাথে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে তাদের সাথেও কোনদিন তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি। কোন শত্রুও তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা ভংগের অভিযোগ আনতে পারেনি

চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে তিনি এত কঠোর ছিলেন যে, হোদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত এই ছিল যে, মক্কা থেকে কোনলোক মুসলমান হয়ে মদীনায় মহানবীর কাছে আশ্রয় নিতে আসলে তাকে তিনি মক্কায় ফেরত পাঠাবেন কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কোন লোক মক্কায় পালিয়ে আসলে কোরাইশরা তাকে ফেরত দেবে না। এ শর্ত নির্ধারিত হওয়ার পর হযরত আবু জুন্দুস (রাঃ) মক্কা থেকে পালিয়ে মহানবীর (সঃ) দরবারে হাজির হয়। নির্মম অত্যাচারে তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত আর পায়ে লোহার কড়া, তিনি মাহনবী (সঃ) কে বলেন— আমি মুসলমান হয়ে গেছি এজন্যেই আমার ওপর এ অমানুষিক নির্যাতন চালান হয়েছে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে এ হিংস্র কাফেরদের বন্ধন থেকে মুক্তি দিন। আমার মুক্তির ব্যবস্থা করুণ। শুনে মহানবী (সঃ) তাঁকে শান্তনা দিয়ে বলেন, ভাই চুক্তির শর্তাবলি নির্ধারিত হয়ে গেছে। অতএব এ ব্যাপারে আমার করার কিছুই নেই। এবার বিবেচনা করে দেখুন, চৌদ্দশ বীর যোদ্ধা যার অধীন সবাই অস্ত্রসজ্জিত। যাঁর একটিমাত্র ইংগিতে হযরত আবু জুন্দুসকে মুক্ত করা যায় কিন্তু চুক্তির শর্তাবলি নির্ধারিত হওয়ার কারণে চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন এবং ঐ অবস্থায় তাঁকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর চাইতে বড় প্রতিজ্ঞা রক্ষার দৃষ্টান্ত আর কিইবা হতে পারে।

পূর্ণাংগ পথপ্রদর্শক

সার কথা যে, মহানবী (সঃ) জীবনের যে কোন অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হউক না কেন সে অধ্যায়েই তাঁকে একজন পূর্ণাংগ মানুষ হিসেবে পাই তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্ব মানবতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। যে কোন দিক থেকেই বিচার করা হউক না কেন তাতে কোন ত্রুটি চোখে পড়বে না। তাঁর জীবনের সকল বৈশিষ্টের কারণেই তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয় থাকে না। আর তিনি যে আমাদের জন্যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত পথ প্রদর্শক সে ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই। মানুষ কোন মানুষের হাতে তখনই হাত রাখতে পারে এবং নিশ্চিন্তে তাকে অনুসরণ করতে পারে যখন ঐ লোকটি সম্পর্কে তার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এই সর্বাধিক বিশ্বস্ত এবং নিখুঁত নিষ্কলংক চরিত্রের অধিকারী। গোটা মানব জাতির ইতিহাসে মহানবীর (সঃ) চাইতে পূর্ণাংগ ও বিশ্বস্ত চরিত্রের মানুষ অন্য কেউ জন্ম গ্রহণ করেনি। অতএব মহানবীর (সঃ) ব্যক্তিত্বের মত গুণাবীর বিশিষ্ট অন্য কেউ নেই যাকে সর্বাংগিন প্রথপ্রদর্শক মানা যেতে পারে। যদিও অন্য সকল নবীদের সম্পর্কে আমাদের অটল বিশ্বাস যে, তারা আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। মহানবীর (সঃ) কারণেই আমাদের মনে এ বিশ্বাস জন্মেছে। অন্য যে সকল ধর্মগ্রন্থে তাঁদের (আঃ) কথা উল্লেখিত হয়েছে সে সকল গ্রন্থের বর্তমান যে অবস্থা তাতে তাদের ব্যক্তিত্ব খর্ব করা হয়েছে। তাঁদের চরিত্রের বিকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তদুপরি এ সকল নবীর জীবনের কোন রেকর্ড আজ সংরক্ষিত নেই যাকে অনুসরণ করা যেতে পারে। আমরা তাঁদের উপর ঈমান আনলেও তাঁদের জীবনের নির্ভুল রেকর্ড আমাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকার কারণে তাদের থেকে কোন পথ নিদের্শ লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র মহানবী (সঃ) এর জীবন সম্পর্কিত পূর্ণাংগ রেকর্ড বিস্তারিতভাবে আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে যার ফলে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে আমরা তার থেকে পথ নির্দেশ লাভ করতে পারি। মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে সম্পর্কে মহানবী (সঃ) কোন পথ নির্দেশ দেননি এবং তাঁর বাণী সাহাবা কেরামগণ সংরক্ষিত রাখেননি। মানুষের ব্যাক্তি জীবন কিংবা পারিবারিক, জীবন, ব্যবসায় কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনা। শান্তি কিংবা যুদ্ধ এক কথায় জীবনের

যে কোন দিক ও বিভাগ বিচার করে দেখা হউক না কেন সকল ক্ষেত্রেই তাঁর পথনির্দেশনার সন্ধান পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মুহম্মদ (সঃ) প্রত্যেক ব্যাপারেই একজন পূর্ণাংগ পথ প্রদর্শক। তিনি একজন বিশ্বস্ত আখলাক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তার জীবনে গোটা মানব জাতির জন্যে পথনির্দেশনা বিদ্যমান।

মহানবী (সঃ) এর মত ব্যক্তিত্বের সামনে থাকার পরও যে অন্য কোন মানুষকে নেতা ও পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে এবং অন্য কোন মানুষের নেতৃত্ব কবুল করে তাকে আমি বলবো যে সে অন্ধ। কারণ কোন দিকে কোথায় আলো তা তার চোখে পড়ছে না। এবং তার সামনে পথ প্রদর্শনের সর্বোত্তম নিদর্শন বিদ্যমান থাকা সত্বেও সে ঐ সকল মানুষকে অনুসরণ করছে যাদের সম্পর্কে সে নিজেও অবগত যে, তাদের জীবন অসংখ্যা ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। কোন কোন মহাপুরুষের জীবনে কোন একটি দিক শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণাংগ হলেও অপরাপর দিক গুলো দুর্বল ও অপূর্ণাংগ অতএব পূর্ণাংগ পথ নির্দেশনা লাভের যোগ্য নয়।

মহানবী (সঃ) এর গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। এটা একটা অতল অথৈ মহাসমুদ্রের তুল্য। কেবল তাঁর গুণকীর্তন করাই আমাদের কাজ নয়। যদিও এটা একটা পূণ্যের কাজা কিন্তু আমাদের প্রকৃত কাজ হচ্ছে বাস্তবে মাহনবীর (সঃ) পদাংক অনুসরণ করা এবং তাঁর অনুসৃত পথ অবলম্বন করা। এটাই হবে প্রকৃত অনুসারীর কাজ।